Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
Impact Factor: 6.28 *(Index Copernicus International)*
Volume-VI, Issue-II, October 2017, Page No. 17-23
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাস 'অসিধারা' : অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণের আলোকে

মহাশ্বেতা চ্যাটার্জি
অতিথি অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, কাজি নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়, আসানসোল, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract

In the year 1918 a poet, novelist, essayist, short story writer -Narayan Gangopadhyay was born at Baliadingi in Dinajpur, now in Bangladesh. He took his name narayan, as his pen name. He was always a best critic of his own creation. He always believes that Literature was not a tool of entertainment. He minutely concentrated in literature for society's well-being. He was very open minded writer, he was not immersed himself any prejudice while he was written up. He was not stuck any subject. If he was feel boared to any content of his writing, he change it immidiately. In Narayan Gangapadhyay's writing; history, politics, critical human relationship–all were came through a harsh reality. 'Ashidhara' one of his not very renowned novel. Literature -critics are not discussing about this novel; but this novel gave some new aspects. 'Ashidhara' is a kind of vow or a critical devotion for husband and wife. In these novel Supriya was a leading charactor, was Atish blown free air for her life? Why this novel was exceptional? We are finding this answer through this article. What exactly novelist tell us in this novel?

Key words: Vow, Critical- Reletionship,Identity, Reality,Completeness.

তিরিশের দশকে বাংলা কথাসাহিত্যের জগতে এক অন্যতম নাম হোল নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। তারাশঙ্কর-বিভূতিভূষণ-মানিক –এই ত্রয়ী বন্দ্যোপাধ্যায়ের যোগ্য উত্তরাধিকারী ছিলেন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। কৈশোর থেকে যৌবনের প্রথম দিকটা তাঁর কেটেছিল উওরবঙ্গের দিনাজপুর জেলায়। তাঁর লেখায় বারং-বার বাস্তবের রূঢ় দিক গুলিই ফুটে উঠেছিল। বৃহত্তর জনজীবনের বৃওকে তিনি ছুঁয়ে দেখেছিলেন।

সমাজের অবস্থান এবং বিবর্তনের চিত্রকে নারায়ণ অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছিলেন। সংসারের জটিল আর্বতে ঘুরপাক খেতে থাকা, দৈনন্দিন নাগরিক জীবনের জাঁতাকলে পিষ্ট মানুষজনের হুবহু ছবি সাহিত্যিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখায় জীবন্ত হয়ে উঠেছিল।ইতিহাস, সমাজ, রাজনীতি, নর-নারীর জটিল সম্পর্ক, দেশকাল-সময় দ্বারা আচ্ছন্ন এক বৃহৎ পটভূমি,মধ্যবিত্ত সমাজ এছাড়াও প্রকৃতি তাঁর লেখায় যেন এক অন্য মাত্রা যোগ করেছিল।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখা প্রথম উপন্যাস; 'উপনিবেশ' (প্রথম পর্ব) ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশ লাভ করে।চারটি পর্বে তাঁর উপন্যাস গুলিকে বিভক্ত করা যেতে পারে। প্রথম পর্ব (১৯৪৩-১৯৪৮ খিষ্টাব্দ)- 'উপনিবেশ'**,**'মন্দ্রমুখর', 'স্বর্ণসীতা', 'সম্রাট ও শ্রেষ্ঠী', 'সূর্যসারথি'। (১৯৪৯-১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দ) দ্বিতীয় পর্বের মধ্যে রয়েছে -'বিদিশা', 'শিলালিপি', 'লালমাটি', 'মহানন্দা', 'পদসঞ্চার'। তাঁর তৃতীয় পর্বের লেখা গুলি (১৯৬৬-১৯৭০ খ্রিস্টাব্দ) হোল- 'অসিধারা', 'মেঘরাগ', 'নিশিযাপন', 'ভস্মপুতুল'। চতুর্থ পর্বের লেখা গুলি (১৯৬৬-১৯৭০ খ্রিস্টাব্দ)

– 'সন্ধ্যার সুর', 'পাতাল কন্যা', 'নির্জন শিখর', 'তৃতীয় নয়ন', 'কাঠের দরজা' 'আলোকপর্ণা'। তাঁর রচিত উপন্যাস গুলি চারটি পর্ব বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় ; প্রত্যেকটি উপন্যাসই স্বতন্ত্র বা বলা যেতে পারে মৌলিক।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচিত তৃতীয় পর্বের উপন্যাসগুলির মধ্যে 'অসিধারা' একটি অন্যতম উপন্যাস। ইতিহাসের অনুষঙ্গ বার-বারই এসেছে ঔপন্যাসিক নারায়ণের উপন্যাসে। লেখক প্রায়শই হয়েছেন ইতিহাসচারী। তিনি তাঁর তৃতীয় পর্বের লেখা গুলিতে চেনা কাহিনি বৃত্ত থেকে অনেকখানি সরে এসেছেন, বা বলা যেতে পারে 'চেনামহল' থেকে 'shifted' হয়েছেন এক অচেনা বৃত্তে। সেখানে পুরুষ ও নারীর সম্পর্কের নতুন সমীকরণকে প্রতিষ্ঠা- কল্পে রত হয়েছেন নারায়ণ ***গঙ্গো***পাধ্যায়। ব্যক্তি সম্পর্কের ক্রমশ জটিল রূপকে তিনি অত্যন্ত যত্ন সহকারে উপস্থাপিত করেছেন।

আমাদের আলোচিত 'অসিধারা' উপন্যাসটির শুরুই হয়েছে এক অনবদ্য সুরেলা আবহে। গোলাপী শাড়ি পরিহিতা, সরস্বতী মূর্তি স্বরূপা, সঙ্গীত সাধিকা; সুপ্রিয়া নিবিষ্ট মনে সন্ন্যাসিনীর মতোই সংগীত চর্চাই নিমগ্ন। গোটা উপন্যাসের কেন্দ্রভূমিতে সুপ্রিয়া-ই মধ্যমণি হিসাবে বিরাজমান। এক স্বপ্নালু সাংগীতিক পরিমন্ডলে মুখরিত হয়েছে উপন্যাসের প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পর্বটি। সমগ্র উপন্যাসটি পাঁচটি অধ্যায়ে বিভক্ত,এছাড়াও রয়েছে প্রতি অধ্যায়ে কয়েকটি করে পর্ব। উপন্যাসটি অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত মহাশয়কে উৎসর্গ করেছেন ঔপন্যাসিক নারায়ণ ***গঙ্গো***পাধ্যায়।

একটি ব্রতাচারকে আবর্ত করে এক অনবদ্য উপন্যাস হিসাবে 'অসিধারা'- সমগ্র বাংলা সাহিত্যে একটি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্তস্বরূপ বিরাজমান। 'অসিধারা' শব্দটির সঙ্গে আমরা খুব বেশী পরিচিত নই। অসিধারা একটি ব্রত। যে দম্পতি এই ব্রত পালন করেন তাদের সংযত জীবযাপন করতে হয়। তারা একই শয্যায় শায়িত হলেও তাদের উভয়ের মধ্যিখানে থাকে উন্মুক্ত অসির প্রাচীর। পরস্পর –পরস্পরকে স্পর্শ করতে পারেন না। এই ব্রত অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করতে হয়।

উপন্যাসের নায়িকা সুপ্রিয়া। তাকে কেন্দ্র করেই নানান ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে এগোতে থাকে কাহিনির কথনবৃত্ত। সঙ্গীত গুরু দুর্গাশঙ্করের ছাত্রী সুপ্রিয়া। গান হোল তার জীবন। নিষ্ঠা সহকারে সে সঙ্গীতের সাধনা চালিয়ে গেছে।গান মিশে ছিল তার রন্ধ্রে-রন্ধ্রে। সুপ্রিয়া ছিল সৌরভে পরিপূর্ণ ফুলের মতো; অসংখ্য মৌমাছি সেই সৌরভ পান করার জন্য ছুটে এসেছে। সেই সুবাস স্বেচ্ছায় বিতরিত করেছে সুপ্রিয়া। তাকে মন-প্রাণ দিইয়ে পেতে চেয়েছে অতীশ। অতীশের প্রেমে কোনো কার্পণ্য ছিল না। সে তার অন্তর উজাড় করে নিংড়ে দিতে চেয়েছে তার প্রেম; সেখানে কোনো ফাঁক রাখেনি অতীশ। সে বিজ্ঞানের উচ্চশিক্ষিত ছাত্র। সঙ্গীতের বিষয়ে তার বিন্দুমাত্রও অনুরাগ ছিল না। সে গান ও জানত না।তাকে সুপ্রিয়া কেমন করে গ্রহন করে? তার চলার পথের সঙ্গী কেমন করে একজন গানের বাইরের জগতের মানুষ হতেঁ পারে? এই দ্বিধা কিছুতেই কাটিয়ে উঠতে পারছিল না সুপ্রিয়া। তাই তো সুপ্রিয়া অনায়াসে, অকপটে সত্যি কথাটি বলতে পেরেছে—

"তোমাকে নিয়ে আমি কী করব বলো তো অতীশ? আমার কী কাজে তুমি লাগবে?" [১]

অতীশকে সে ভালোবেসেছে কিন্তু,চলার পথের দোসর করে নিতে বার-বারই ইতস্তত করেছে। এই দ্বন্দ্ব তার মনে স্থান পেয়েছে তীব্র সঙ্গীতের প্রতি সংরাগ থেকেই।

কলকাতার কলেজে পড়তে আসার আগে তার ছোটবেলার সাথি কান্তির সম্পর্কে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন ঔপন্যাসিক। একজন পলাতক খুনির সন্তান ছিল কান্তি। যেদিন সে তার পিতৃ পরিচয় জানতে পারে সেদিন মনের দুঃখে ছুটে যাই সুপ্রিয়ার কাছে। সুপ্রিয়া তাকে আশ্বস্ত করে যে সে তাকে ফেলে কোনোদিন যাবে না। ম্যাট্রিকে ফেল করলেও, তবলায় পি.এইচডি করেছে সে। তাই স্বচ্ছন্দে তার সঙ্গে দ্বিধাহীনভাবে মিশতে পেরেছিল সুপ্রিয়া। সে বলতে-ও পেরেছিল—

"তোমার কেউ না থাক, আমি আছি।"[২]
"চিরদিন। চিরদিন আমি তোমার জন্যে থাকব।"[৩]

সুপ্রিয়ার বাবা যখন লখনউয়ে থাকতেন তখন তাদের পাশের বাড়ির বাসিন্দা ছিলেন দীপেন বোস। বড় মাপের একজন সঙ্গীত বিষারদ ছিলেন দীপেন বোস। গানের ভিতর দিয়েই তাদের মধ্যে সখ্যতা গড়ে ওঠে। সরাসরি সুপ্রিয়াকে তার গানের জগতের সঙ্গিনী হবার প্রস্তাব দিয়েছিলেন দীপেন বোস। নির্দিদ্ধায় নাবালিকা সুপ্রিয়াকে তিনি বলেছিলেন—

"আমাকে বিয়ে করো তুমি। আমার গানে তুমি প্রেরণা হও।তোমার ছোঁয়ায় আমার সুর আরো সুন্দর হয়ে উঠুক। সুপ্রিয়া তুমি আমায় ছেড়ে যেয়ো না।"[৪]

সুপ্রিয়া তার জীবনে কাকে গ্রহন করবে এই চিন্তায় জেরবার হয়ে গেছে। ইন্দুমতী,মন্দিরা, রেবা -তার জীবনের জটিলতাকে দিন-দিন বাড়িয়ে তুলছিল।ফলে জীবনের জটিল গোলকধাঁধায় ক্রমাগত আষ্টেপিষ্ঠে জড়িয়ে গেছে। জীবনের জট খোলার পরিবর্তে তা আরও গভীর সঙ্কটে পর্যবসিত হয়েছে।

যখনই জীবনের সমস্যা গুলো বড় হয়ে দাঁড়িয়েছে সুপ্রিয়ার কাছে, তখনই সে সঙ্গীতের সমুদ্রে অবগাহন করেছে। তার জীবনে বেঁচে থাকার রসদ যুগিয়েছে সঙ্গীত।

"কত শেখবার আছে।সারা ভারতবর্ষে গানের তীর্থ-গীতশ্রীর দেবালয়। সেই তীর্থে তীর্থে প্রদক্ষীণ করতে হবে তাকে, প্রণাম করতে হবে কত বিশ্বনাথের দেউলে, কত মহাকাল মন্দিরে, কত কাঞ্জীভরমের জ্ঞানব্যাপী -গোপুরমে। কত গুরুর কাছে দীক্ষা নিতে হবে। তারপথ সারা ভারতবর্ষময় ছড়িয়ে আছে। তার গান ছড়িয়ে আছে রাজপুতানার বিশাল মরুভূমিতে, আওরব সমুদ্রের কলাগর্জনে,সেতুবন্ধ রামেশ্বরের ত্রি-সমুদ্রের সঙ্গম-রাগিনীতে।"[৫]

জীবন ও গান যেন অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত হয়ে গেছে সুপ্রিয়ার চলার পথে। সমস্ত কিছু ছেড়ে দিয়ে দীপেন বোসের বোম্বে যাওয়ার প্রস্তাবে রাজি হয়ে কাকাকে ছেড়ে দিয়ে চলে যাই গানের সাগরে ডুব দেবে বলে। বড় গায়িকা হবার হাতছানিকে সে অস্বীকার করতে পারে নি।নিজের সঙ্গে নিজের বাক্যালাপ চলতে থাকে।

"আরো বড় জগতের মধ্যে পা বাড়াতে হবে, আরো বড় জীবনের মুখোমুখি হতে হবে।"[৬]

সুপ্রিয়ার স্বপ্নাতুর দুই চোখ যেন কল্পনার ডানায় ভর করে উড়তে থাকে। সে চলে যাই বোম্বে। তার জীবনচক্র ঘুরতে থাকে অন্য খাতে। সে বুঝতে পারে না কাকে গ্রহন করবে সে তার জীবনের জীবনসঙ্গী হিসাবে। গানের চর্চা,রেকর্ডিং চলতে থাকে তার। কিন্তু গলায় এক জটিল রোগ বাসা বাঁধলো। অস্ত্রপোচার করতে হলো,কিন্তু গলার স্বরভঙ্গ হয়ে গেল সুপ্রিয়ার।সুর গেল একেবারে জীবন থেকে হারিয়ে। জল ছাড়া মাছের যেমন কোনো অস্তিত্ব থাকে না; ঠিক তেমনই জীবনকে সারহীন মনে হতে লাগল তার। এবার তাকে জীবনে কী কেও গ্রহন করবে ? সে কলকাতায় ফিরে এলো। সেই সময় অতীশ এসে তার হাত ধরলো।জীবনের চূড়ান্ত বিপর্যের মধ্য দিয়ে প্রেমাস্পদকে যোগ্য জীবন সঙ্গীকে লাভ করলো সুপ্রিয়া। জীবনে যে চূড়ান্ত সাধনায় সিদ্ধি লাভের উদেশ্যে কারোর সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধে নি সুপ্রিয়া, সেই সমস্যার -ও সমাধান বের করে ফেললো অতীশ। দুইজনের মধ্যে শর্ত হলো - যখন সুপ্রিয়া আবার নতুন কোনো সাধনায় নিজেকে পূর্ণ করে তুলবে তখনই উভয়ের মিলন পূর্ণ রূপ নেবে।অতীশ স্বেচ্ছায় অসিধারা ব্রত পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহন করে। সুপ্রিয়ার ভাঙ্গা-চোরা মনটাকে অতীশ একেবারে পরিপূর্ণ করে দেয়। নবজীবন অধ্যায়ের সূচনার ইঙ্গিত দিয়েই ঔপন্যাসিক অনবদ্য উপন্যাসটির পরিসমাপ্তি ঘটিয়েছেন।

'অসিধারা' উপন্যাসটির বিশেষ বিশেষ চরিত্র গুলির দিকে তাকালে আমরা দেখবো,আগাগোড়া বাস্তবের চাদরে মোড়া চরিত্র গুলি।প্রত্যেকটা চরিত্রর-ই নিজস্ব 'Stand-point' রয়েছে। প্রায় প্রত্যেকটি চরিত্রই 'Active'।

উপন্যাসে কোনো না কোনো প্রয়োজন তারা পূরণ করতে সক্ষম হয়েছে। ঔপন্যাসিক নারায়ণ ***গঙ্গো***পাধ্যায় চরিত্র তৈরিতে কোনো রকম ফাঁক রাখেননি।

প্রথমেই যে চরিত্রটি আমাদের মনে দাগ কেটে গেছে সেই চরিত্রটি সম্পর্কে আলোচনা করবো। সমগ্র উপন্যাসের প্লট তাকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়েছে। আরো যে সমস্ত চরিত্রগুলিকে আমরা উপন্যাসে পেয়েছি,প্রায় সেই সমস্ত চরিত্রই এসেছে সুপ্রিয়ার হাত ধরে। উপন্যাসের একেবারে শুরুতে ওস্তাদ দুর্গাশঙ্করের কাছে গানের সাধনায় লীন থাকতে দেখেছি আমরা সুপ্রিয়াকে। গোলাপী শাড়িতে মুদ্রিত নয়নে বেহাগের বিস্তার করে চলেছিল সঙ্গীত সাধিকা সুপ্রিয়া। ঔপন্যাসিক নারায়ণ ***গঙ্গো***পাধ্যায় স্পষ্ট বুঝিয়ে দিয়েছেন সঙ্গীতকে কেন্দ্র করেই এই উপন্যাসের কাহিনি রচিত হয়েছে। যেন সরস্বতীর বরপুত্রী সুপ্রিয়ার মর্ত ধামে আগমনই ঘটেছে সংগীতের আরাধনা করার জন্য। সুপ্রিয়া গানের জন্যই নিবেদিত প্রাণ। জীবনের সমস্ত বাঁধা বিপত্তিকে সে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিতে পেরেছিল শুধুমাত্র গানকে ভালোবাসে বলেই। কোনো সমস্যাকেই সে বড় করে দেখেনি। যেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গানের ভাষাতে বলা যেতে পারে।

"গানের ভিতর দিয়ে যখন দেখি ভুবনখানি
তখন তারে চিনি আমি,তখন তারে জানি।
তখন তারি আলোর ভাষায় আকাশ ভরে ভালোবাসায়,
তখন তারি ধুলায় ধুলায় জাগে পরম বাণী।।
তখন সে যে বাহির ছেড়ে অন্তরে মোর আসে,
তখন আমার হৃদয় কাঁপে তারি ঘাসে ঘাসে।
রূপের রেখা রসের ধারায় আপন সীমা কোথায় হারায়,
তখন দেখি আমার সাথে সবার কানাকানি।।"[৭]

অর্থাৎ জীবনের সমস্ত ভাষায় তার কাছে যেন সপ্তম সুরের জবানিতেই ধরা দিয়েছে। সঙ্গীতের সংকেতই তার চেনা চৌহদ্দি। সুপ্রিয়া খুব সহজেই সবার আপনার জন হতে পেরেছিল। সে অনায়াসেই ছোটবেলার বন্ধু কান্তিকে তার বিপদে সাহায্য করেছে। সদ্য পিতৃ পরিচয় জানার পর কান্তি যখন মানসিকভাবে একেবারে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে তখন তাকে পাশে থাকার আশ্বাস প্রদান করে সুপ্রিয়া। কান্তি যখন বলেছে সে, সুপ্রিয়াকে পাবার জন্য তপস্যা করছে; তখন সুপ্রিয়া বলেছে—

"আমি এমন কিছু দুর্মূল্য নই কান্তিদা যে, তার জন্য তুমি এমনভাবে সংসার নষ্ট করবে। তুমি বড় ওস্তাদ হও, গুণী হয়ে ওঠ,সারা দেশের মানুষ চিনে নিক তোমাকে। কিন্তু আমার জন্যে কোনো দাম তুমি দিচ্ছ, এ-কথা শুনলে আমার লজ্জাই বেড়ে যেতে থাকে।"[৮]

অর্থাৎ কারোর সবটুকু মর্যাদা কেড়ে নিয়ে কোনো কিছু পাবার জন্য উদ্গ্রীব না সুপ্রিয়া। সুপ্রিয়া তার অনেক প্রিয় মানুষদের কাছেই দুর্বোধ্য ছিল।হয়তো তারা সেই রকম ভাবে বুঝতে চেষ্টাই করে নি। দীপেন বোস-গানের জগতের নামজাদা ব্যক্তিত্বও সুপ্রিয়াকে সাধন সঙ্গিনী হিসাবে গ্রহন করতে চেয়েছিল। কিন্তু এই গ্রহনের মধ্যেও কোথাও যেন শারীরিক আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করার তীব্র বাসনা রয়েছে বলে মনে হয়েছিল সুপ্রিয়ার। সুপ্রিয়ার কান যেন ব্যাকুল হয়েছিল শোনার জন্য—

"কেউ একটা নতুন কিছু বলুক,আরও গভীর কোনো বেদনা,মানুষের মর্মচারী আরো কোনো একটা আশ্চর্য যন্ত্রণাকে আবিষ্কার করুক কেউ,সেই নিবিড় নিঃশব্দ-সঞ্চারী ব্যথা সুরে সুরে অসংখ্য প্রদীপের দীপান্বিতা জ্বালিয়ে দিক,তার আলো আকাশের তারার সঙ্গে মিশে গিয়ে দূরতর দিগন্তে বিস্তীর্ণ হয়ে যাক। কিন্তু এ-ও যেন বাঁধা ছকে চলছে।সেই মদের গ্লাসের আগুন ঢেলে তিলে তিলে নিজেকে নিঃশেষে দাহন করা,

দিনের পর দিন একটু একটু করে আত্মহত্যার বিলাসিতা, স্বপ্ন-সাকীর জন্যে কান্নার আত্মরতি। সব পুরোনো, সব একঘেয়ে হয়ে গেছে।"[৯]

জীবনের যে তালটির সঙ্গে সে সঙ্গত করেছিল,সেই তালটিকে সঠিক ভাবে বুঝে তার-ই সাথে যুগলবন্দী গাওয়ার মতো সম্ঝদার 'Companion' সে কিছুতেই খুঁজে পাচ্ছিল না। অতীশকে সুপ্রিয়া ভালোবেসেছে কোনো ভান ছাড়ায়।

"আমি আরো আরো অনেকেই ভালবাসতে পারি।কাউকে রূপের জন্যে,কাউকে গানের জন্যে, কাউকে বিদ্যার জন্যে। সব ঐশ্বর্য একজনের মধ্যে নেই। আমি সকলের কাছ থেকে নিতে পারি।"[১০]

সুপ্রিয়া কোনোদিন মিথ্যাচার করেনি। নিজেকে খোলা বইয়ের পাতার মতোয় উন্মুখ রেখেছে। সুপ্রিয়ার কোনো ছলনা জানা ছিল না। তার জীবনের সর্বোত্তম সত্যই ছিল গান; গানকেই সে মন-প্রাণ দিইয়ে ভালোবেসেছে। তার সাধনার পথে প্রেম কেও সে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াতে দেয় নি। তাই স্বরভঙ্গ অবস্থায় যখন সে কলকাতায় ফিরে আসে তখনও কারোর বোঝা হয়ে যেতে চায়নি। অতীশকে সে জীবনে গ্রহন করেছে। হয়তো যে খাঁটি সোনা সরূপ যোগ্য হৃদয়ের সন্ধান সে করছিল,তাকে অবশেষে সে পেয়েছে। তিরিশের দশকে একজন পুরুষ ঔপন্যাসিক যে বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে সুপ্রিয়া চরিত্রটিকে গড়ে তুলেছেন তা এক কথায় অবিস্মরণীয়। সুপ্রিয়ার মতো একটি উন্মুক্ত-মনা,স্বাধীনচেতা নারীচরিত্র সমগ্র বাংলা সাহিত্যে খুবই কম পাওয়া যায়।

কান্তি চরিত্রটি গোটা উপন্যাসে অতি সক্রিয়। সে সুপ্রিয়াকে ভালোবেসেছে, এ-কথা সত্য।কিন্তু একবারও সুপ্রিয়াকে বোঝবার চেষ্টা করেনি। নিজের দুঃখ, নিজের বেদনায়- মুহ্যমান হয়ে সে সুপ্রিয়ার কাঁধ খুঁজেছে যেখানে সে তার দুঃখের অশ্রু বিসর্জিত করেছে। সুপ্রিয়াকে সঙ্গে কোনোদিনও সঠিক ভাবে বুঝতে চেষ্টা করে নি। মাঝে মাঝেই সে অবিবেচকের কাজ করে ফেলেছে। নিজেও ভুগেছে তার জন্য এবং অন্যদের-ও ভুগিয়েছে।

দীপেন বোস চরিত্রটিও খুব একটা সুবিধার নয়। একজন নাবালিকাকে তার গানের লীলাক্ষেত্রের সাধনার -সাথী হবার প্রস্তাব দিয়েছেন। তার এই কাজ চূড়ান্ত অবিবেচকের মতো কাজ। এতবড় মাপের সঙ্গীত গুরু-ও কিন্তু দেহজ কামনা -বাসনার উর্দ্ধে মুখ তুলে দাঁড়াতে সক্ষম হননি। সাধন মার্গের চূড়ান্ত পর্যায়ে ওঠার রাস্তা তিনি দেখাতে পারেননি। তিনিও স্বপ্নবেচার চোরা -কারবার-ই ফেঁদেছিলেন একথা আর পাঠকের বুঝতে বাকী থাকে না। সুপ্রিয়া যখনই তাকে বিবাহ করার প্রস্তাব দীপেন বোস -কে দিয়েছে ; তখনই দীপেন বোস স্বেচ্ছায় এই প্রসঙ্গটি এড়িয়ে গেছেন। তাই এই চরিত্রটি -ও পাঠকের খুব বেশী সমীহ লাভ করতে পারেনি।

অতীশ চরিত্রটি এই উপন্যাসের একটি নজরকাড়া চরিত্র। উপন্যাসের একেবারে গোড়া থেকেই সে যথেষ্ট সপ্রতিভ। সুপ্রিয়াকে সে মন-প্রাণ উজাড় করে ভালোবেসেছে। বিজ্ঞানের এই উজ্জ্বল ছাত্রটি সুপ্রিয়ার সঙ্গে যোগ্য গানের সঙ্গতকারী হতে পারবে না কোনোদিনই একথা যেনে বেদনাহত হয়েছে। সুপ্রিয়ার তাকে জীবনসঙ্গী হিসাবে বর্জন করে দেওয়া-ও তাকে সুপ্রিয়াকে ভালোবাসা থেকে বিরত করতে পারে নি। অতীশ অনায়াসেই বলতে পেরেছে—

"তোমার জন্যে আমি সব পারব সুপ্রিয়া। সকলকে ছেড়ে তোমাকেই বুকে তুলে নিয়ে যাব।"[১১]

জীবনের অনেক ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য করে যখন সুপ্রিয়া তার কাছে এওকেবারে নিঃস্ব, রিক্ত হয়ে ফিরে এলো, তখনও তার সামনে ঢাল হয়ে দাঁড়ালো অতীশ।সে প্রকৃতই পেরেছিল তার কথা রাখতে। অতীশ সুপ্রিয়াকে দিয়েছিল আশ্রয়। রিক্ত সুপ্রিয়া যখন দ্বিধান্বিত, তখন অতীশ বলেছে—

"বেশ তো, যেদিন করুণার সীমা ছাড়িয়ে উঠবে, সেইদিনই ভলোবাসা দাবি করব তোমার কাছে।"[১২]

জীবনের মূল স্রোতে সুপ্রিয়াকে ফিরিয়ে আনার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছে অতীশ। জীবন যে কোনোদিনই শূন্য হতে পাড়ে না তা তাকে সে বুঝিয়েছে।সুপ্রিয়ার গলার গান বন্ধ হয়েছে ঠিকই কিন্তু তার ভেতরের শিল্পী সত্তাকে বাঁচিয়ে রাখার অদম্য প্রয়াস চালিয়েছে অতীশ। এমনকি অসিধারা ব্রতের কঠিন নিয়ম পালন সে স্বেচ্ছায় করেছে। পাঠকের মনের মণিকোঠায় আজও এক স্বতন্ত্র স্থান অতীশ দখল করে রয়েছে।

এছাড়াও রেবা,মন্দিরা, অমিয়বাবু, মিস্টার আয়ার, শ্যামলাল, ইন্দুমতী –চরিত্র গুলি নিজ নিজ মৌলিকত্ব নিয়ে উপন্যাসে জ্বলজ্বল করে চলেছে।

উপন্যাসটির প্লট কোথাও এতটুকুও শিথিল হয়নি। ঔপন্যাসিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় অসাধারণ মুন্সীয়ানায় ফুটিয়ে তুলেছেন উপন্যাসের প্রত্যেকটি অধ্যায়কে।সমগ্র উপন্যাসে ছোট ছোট মুহূর্ত গুলিই এককথায় অনবদ্য।

ব্রত যা আমাদের কামনার স্বরূপকে প্রতিফলিত করে, আমাদের চিত্তের শুদ্ধি ঘটায়। হঠাৎ করে ইতিহাসচারী, রাজনৈতিক,মধ্যবিত্ত জীবনের সফল কথাকার একটি ব্রতকে কেন্দ্র করে উপন্যাস লিখে ফেলবেন,একথা আমাদের ভাবতে দুইবার হোঁচট খেতেই হয়। কোন একটি ব্রতই যে উপন্যাসের প্রেক্ষাপট হতে পারে এটা আমরা আমাদের ভাবনার সীমা রেখার মধ্যেও আনতে পারি না। যে শিকড় গুলিকে আমরা তথাকথিত শিক্ষিত সমাজ অস্বীকার করি, ঔপন্যাসিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় সেই হারিয়ে যাওয়া ব্রতকে তুলে এনে, উপন্যাসের উপজীব্য করে তুলেছেন।

> *"ব্রত হচ্ছে মানুষের সাধারণ সম্পত্তি, কোনো ধর্মবিশেষের কিংবা বিশেষ দলের মধ্যে সেটা বদ্ধ নয়, এটা বেশ বোঝা যাচ্ছে। এটাও বেশ বলা যায় যে, ঋতুপরিবর্তনের সঙ্গে মানুষের যে দশাবিপর্যয় ঘটত সেইগুলোকে ঠেকাবার ইচ্ছা এবং চেষ্টা থেকেই ব্রতক্রিয়ার উৎপত্তি।"*[১৩]

লেখক 'আসিধারা' বলে যে ব্রতের উল্লেখ করেছেন, সেই ব্রত সাধারণত বিবাহিত দম্পতিরা পালন করে থাকেন। এই ব্রত চূড়ান্ত কৃচ্ছ্রসাধনের মাধ্যমে নিষ্ঠা সহকারে পালন করা হরে থাকে। বেশ কঠোর এই ব্রতের নিয়ম নীতি। বিবাহিত দম্পতি একই শয্যায় শয়ন করলেও পরস্পর মিলিত হবেন না। একে অপরকে স্পর্শ পর্যন্ত করবেন না। দম্পতিদ্বয়ের মধ্যে বিরাজমান থাকবে অসির বাঁধা। খুব সংযত ভাবে এই ব্রতাচার পালন করা হয়ে থাকে।

উপন্যাসে সুপ্রিয়ার যখন গলার স্বর নষ্ট হয়ে যায়, জীবনের বেঁচে থাকার একমাত্র আধার গানকেই হারিয়ে ফেলে; তখন অতীশ তার শিল্পী সত্তার জাগরণ ঘটায়। সুপ্রিয়া যখন তার নতুন সাধন ব্রতে নিজেকে পূর্ণরূপে প্রকাশিত করতে সক্ষম হবে তখন অতীশ তাকে স্পর্শ করবে। তার আগে পর্যন্ত সে 'অসিধারা' ব্রত পালন করবে। এ-যেন পরিপূর্ণ জীবনসঙ্গীর উপযুক্ত পদক্ষেপ। যে যোগ্য মানুষটির খোঁজ করে চলেছিল সুপ্রিয়া; তারই বৃত্ত সম্পূর্ণ হলো। অতীশ-ই শেষ পর্যন্ত হয়ে উঠলো সুপ্রিয়ার যথাযোগ্য প্রাণপুরুষ। উপন্যাসটির 'অসিধারা' নামটি যেন পূর্ণতা লাভ করলো।

তিরিশের দশকে ঔপন্যাসিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'অসিধারা' উপন্যাসে যে খোঁজ বা 'Searching'-টি রয়েছে তা আজও আমাদের ভাবায়। ঔপনিবেশিক প্রতিস্বরকে যেন ঔপন্যাসিক অতি অয়ায়াসেই পরিহার করতে সক্ষম হয়েছেন। এই উপন্যাসে আমরা কোনো নায়ককে বা নায়কচিত চরিত্রকে খুঁজছি না। এখানে নায়িকা চরিত্র অর্থাৎ নারী চরিত্র-ই প্রধান। পুরুষ চরিত্র গুলিকে নায়িকার মনের মতো হয়ে উঠতে হচ্ছে। নায়িকার দোসর হয়ে ওঠার জন্য যথারীতি সংগ্রাম করতে হচ্ছে পুরুষ চরিত্রদের। বাংলা সাহিত্যে এই কাহিনি বিরল। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় যেন অত্যন্ত সন্তর্পনে হিসেব করে পা ফেলেছেন। কোথাও এতটুকু ত্রুটি রাখেন নি। 'অসিধারা' উপন্যাসটি আর পাঁচটা নর-নারীর দাম্পত্য জটিলতার কাহিনির থেকে অনেকখানি উপরে উঠতে পেরেছে। তাই বলা যায় 'অসিধারা' উপন্যাসটি সমগ্র বাংলা উপন্যাসের ইতিহাসে আজও স্বতন্ত্র ধারার উপন্যাস হিসাবে স্থান লাভ করে রয়েছে।

তথ্যসূত্র:

১। *নারায়ণ* গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী পঞ্চম খন্ড, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়,মিত্র ও ঘোষ পাব্ লিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা পৃষ্ঠা ২০৫

২। তদেব,পৃষ্ঠা ২১২

৩। তদেব,পৃষ্ঠা ২১২

৪। তদেব,পৃষ্ঠা ২১৯

৫। তদেব,পৃষ্ঠা ২২২-২২৩

৬। তদেব,পৃষ্ঠা ২৩৮

৭। *গীতবিতান অখন্ড,* রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পূর্ণ প্রকাশন, কলকাতা, পৃষ্ঠা ১৫-১৬

৮। *নারায়ণ* গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী পঞ্চম খন্ড, মিত্র ঘোষ পাব্লিশার্স কলকাতা, পৃষ্ঠা ২১৩

৯। তদেব, পৃষ্ঠা ২৩৭-২৩৮

১০। তদেব, পৃষ্ঠা ২২৯

১১। তদেব, পৃষ্ঠা ২২৩

১২। তদেব, পৃষ্ঠা ৩৪২

১৩। *বাংলার ব্রত,* অবনীন্দ্র নাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী প্রকাশন, কলকাতা, পৃষ্ঠা ১১

গ্রন্থপঞ্জি :

১। গঙ্গোপাধ্যায় নারায়ণ, *নারায়ণ* গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী পঞ্চম খন্ড, মিত্র ও ঘোষ পাব্ লিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ : ১৩৬২ বঙ্গাব্দ

২। গুপ্ত ক্ষেত্র, *বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস ষষ্ঠ খণ্ড,* গ্রন্থ নিলয়, কলকাতা ৭০০০০৯, প্রথম প্রকাশ: আগষ্ট, ২০০৬

৩। ঠাকুর অবনীন্দ্র নাথ,*বাংলার ব্রত,* বিশ্বভারতী প্রকাশন, ৬ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড কলকাতা-১৭, পুনর্মুদ্রণ: অগ্রহায়ণ ১৪১২ বঙ্গাব্দ

৪। ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, *গীতবিতান অখন্ড,* পূর্ণ প্রকাশন, কলকাতা-৭০০০০৯, প্রথম প্রকাশ: ফেব্রুয়ারী, ২০০২ মাঘ, ১৪০৮ বঙ্গাব্দ

৫। মুখোপাধ্যায় অরুণ, *কালের প্রতিমা বাংলা উপন্যাসের পঁচাত্তর বছর: ১৯২৩-১৯৯৭,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭০০০৭৩, পঞ্চম সংস্করণ : বৈশাখ ১৪১৭ বঙ্গাব্দ, এপ্রিল ২০১০

৬। মুখোপাধ্যায় অরুণ, মধ্যাহ্ন থেকে সায়াহ্নে বিংশ শতাব্দীর বাংলা উপন্যাস, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭০০০৭৩, সংশোধিত ও পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ : ডিসেম্বর ২০০৯